কোনটি ভাগবত অনুসরণে স্বাধীন রচনা, আবার কোনটিতে ভাগবতের কাহিনী অনুসৃত হইলেও পুরাণ-বহির্ভূত কৃষ্ণলীলার লৌকিক ধারাটিকেও সযত্নে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই দিক হইতে পীতাম্বরের ভূমিকা স্বতন্ত্র। তিনি রঘুনাথের ন্যায় ভাগবতেরই অনুবাদ করিয়াছেন, স্বাধীন কাব্য রচনা করিতে বসেন নাই। ফলে অপৌরাণিক ঘটনার সংযোজনা তাঁহার কাব্যে নাই। মূলের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করিয়া তিনি ভাগবতের দশম স্কন্ধের কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাই পীতাম্বরের বিশিষ্ট ভূমিকাটি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে কবি পীতাম্বর ও তাঁহার ভাগবত কাব্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা গেল।

২. পুথির পরিচয় ও সম্পাদন-রীতি

পীতাম্বর-অনুদিত ভাগবতের পুথি সম্পাদনার প্রধান অসুবিধা পুথির অপ্রাচুর্য। কোচবিহার দরবার লাইব্রেরিতে দুইখানি পুথি সংরক্ষিত আছে বলিয়া ড: সুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ও ড: পশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত 'এ ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ অব বেঙ্গলি মানাস্ক্রিপটস প্রিজার্ভড ইন দি স্টেট লাইব্রেরি অব কোচবিহার' গ্রন্থে আমরা মাত্র একখানি পীতাম্বর-অনুদিত ভাগবতের পুথির (পুথিসংখ্যা ৫৮) সন্ধান পাই। পুথিখানি বর্তমানে কোচবিহারে অবস্থিত উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। অপর একখানি পুথি সাম্প্রতিক কালে পাওয়া যাইতেছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমকুমার মৈত্রেয় মিউজিয়মে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুঁথিখানির অবস্থা খুবই জীর্ণ। প্রথম পাতাটি শতছিন্ন। তাহার পর ৭৬-ক পাতা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩১-খ পাতা পর্যন্ত পাওয়া যায়। মধ্যে ১০১ সংখ্যক পাতাটি কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। দেশী তুলট কাগজে লেখা পুঁথির বহু পাতাই আংশিক ছিন্ন ও কীটদষ্ট। অক্ষর অনেক স্থানে এমনভাবে উঠিয়া গিয়াছে যে পাঠোদ্ধার করা একেবারেই অসম্ভব। পুঁথির আকার দৈর্ঘ্যে সাড়ে তেত্রিশ সেন্টিমিটার ও প্রস্থে আঠার সেন্টিমিটার। ইহাতে দুইজন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। ১১৮-খ পর্যন্ত যে হস্তাক্ষর পাওয়া যায় তাহাতে বর্ণাশুদ্ধির অন্ত নাই। লিপিকর নিতান্তই অশিক্ষিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার অসতর্কতা হেতু বহুস্থলে অক্ষর ছাড় পড়িয়া গিয়াছে। ১১৯-ক হইতে যে হস্তাক্ষর দৃষ্ট হয় উহা অনেকটা পরিচ্ছন্ন ও বানানের দিক হইতে অধিকতর শুদ্ধ। শেষের কয়েকটি পাতা না থাকায় পুঁথির লিপিকাল সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না।[১]

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিখানির অবস্থা উপরিউক্ত পুঁথির তুলনায় ভাল। মোটামুটি সম্পূর্ণ বলা চলে। তবে মাঝখানে ২৪ ও ২৫ সংখ্যক পাতা পাওয়া যায় না এবং ৫-খ, ৬-খ, ৭-খ, ৮-খ ও ৯-খ এই কয় পৃষ্ঠার লেখা এমনভাবে মুছিয়া গিয়াছে যে পাঠোদ্ধার অসাধ্য। শেষের পাতা দুইখানিরও জীর্ণ দশা। তবে লিপিকরের নাম ও লিপিকাল পাওয়া যায়। পুঁথির লিপিকাল বাংলা ১২৩৩ সাল, ১২ই বৈশাখ। লিপিকর শ্রীনির্মল দাস। লিপিকর একেবারে অশিক্ষিত না হইলেও অসাবধানী ছিলেন। লিপিকালে বহুস্থানে যেমন অক্ষর ও পদ ছাড় পড়িয়াছে,

---

১. ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলিয়াছেন, 'লিপি দেড়শত বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না।' — ষোড়শ শতাব্দীর একখানি বাংলা ভাগবত (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

তেমনি অতিরিক্ত বর্ণ বা শব্দও অসতর্কতাবশতঃ লেখা হইয়াছে। পুথিতে শ্লোকাঙ্ক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং শেষ শ্লোকাঙ্ক পাওয়া যাইতেছে ২১৩৬। ইহা দৃষ্টে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মোট ২১৩৬টি শ্লোকে পুথিখানি সমাপ্ত। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। পুথির শ্লোক সংখ্যা আরও অধিক হইবে। কারণ লিপিকর বহুস্থলে শ্লোকাঙ্ক উদ্ধৃত করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। কোথাও বা একই শ্লোকাঙ্ক পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। পুথির আকার দৈর্ঘ্যে বিয়াল্লিশ সেন্টিমিটার ও প্রস্থে সাড়ে এগার সেন্টিমিটার। প্রতি পৃষ্ঠায় ছত্র সংখ্যা একরূপ নহে। নিম্নে ৭, ঊর্ধ্বে ১২ পর্যন্ত আছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পুথিখানিকেই প্রস্তুত গ্রন্থের সম্পাদনাকার্যে আদর্শরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। পুথিখানির মধ্যে একটি অতিরিক্ত পাতা পাওয়া গিয়াছে। পাতাটি গ্রন্থের প্রারম্ভ। সম্ভবতঃ লিপিকর উক্ত পাতায় গ্রন্থ লিখন আরম্ভ করিয়া যে কোন কারণেই হউক উহা বর্জন করেন। পাতাটি পরিত্যক্ত হইলেও পুথির মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। পুথি সম্পাদনাকালে উক্ত অতিরিক্ত পাতাটিকেও কাজে লাগান হইয়াছে।

প্রস্তুত গ্রন্থ সম্পাদনায় মূলতঃ বসন্তরঞ্জন রায়-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সম্পাদন-রীতি অনুসৃত হইয়াছে। পুথির মূল পাঠ শোধনের প্রয়াস বড় একটা করা হয় নাই। পুথির পত্রাঙ্ক বন্ধনীমধ্যে যথাস্থানে প্রদত্ত হওয়ায় পাঠক আদর্শ পুথির পংক্তিবিন্যাস সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারিবেন। পুথিতে উল্লিখিত শ্লোকাঙ্কে অজস্র ভুল-ভ্রান্তি থাকায় সম্পাদিত গ্রন্থে শ্লোকাঙ্ক একেবারেই উল্লেখ করা হয় নাই। তাহার প্রাচীনত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত বানানশুদ্ধির প্রয়াস সর্বত্র পরিহৃত হইয়াছে। যে যে স্থলে শব্দ বা পংক্তি একেবারেই মুছিয়া গিয়াছে কিংবা কীটদষ্ট হইয়াছে অথবা অন্য কোন কারণে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব

হয় নাই সেই সেই স্থলে আনুমানিক শব্দ বা পংক্তি বসাইয়া পাঠ পূরণের চেষ্টা করা হয় নাই। কেবলমাত্র লিপিকরের অসাবধানতা হেতু যেখানে যেখানে অক্ষর বাদ পড়িয়াছে সেখানে সেখানে বাদ পড়া অক্ষরটিকে বন্ধনীমধ্যে রাখিয়া অপূর্ণ শব্দকে পূর্ণ করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আ-কার ঈ-কার প্রভৃতি কোথাও বাদ পড়িয়া থাকিলে প্রয়োজন-বোধে তাহা বন্ধনীর মধ্যে বসান হইয়াছে। এরূপ দুটি একটি সামান্য সংশোধন (বা সংযোজন) বাদ দিলে সম্পাদিত গ্রন্থে মূলের পাঠ মোটামুটি অবিকৃতই রহিয়াছে বলা চলে।

৩. কবি-পরিচিতি

পীতাম্বর-রচিত বিভিন্ন কাব্যের যে কয়খানি পুথি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কোনটিতেই কবিপরিচয় নাই। কবির আত্মপরিচয়জ্ঞাপক কোন শ্লোকের সন্ধান কোথাও পাওয়া যায় নাই। কবির বিভিন্ন কাব্য পাঠে শুধু এইটুকুই জানা যায় যে, তিনি কামতানগরাধিপতি বিশ্বসিংহের সভাকবি ছিলেন। বিশ্বসিংহ কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বিশ্বসিংহের পুত্র সমরসিংহই কবিকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করিতেন। খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ লিখিয়াছেন, শুক্লধ্বজের সহায়তায় নরনারায়ণ গৌড় আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু জয়লাভে সমর্থ হন নাই। সেনাপতি শুক্লধ্বজ বন্দী হইয়া গৌড়রাজের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পরে গৌড়ের রাজমাতার অনুগ্রহে মুক্তি পাইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ সময় গৌড়দেশ হইতে তিনি পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ও পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ নামে দুইজন পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া আসেন। উক্ত পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ